# মহাপূজা


অক্ষয়চন্দ্র সরকার

প্রণীত



বেঙ্গল বুক কোম্পানী,

৩০, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,

কলিকাতা

১৩২৮


---

এই গ্রন্থের আয় দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্যয় হইবে।

প্রকাশক
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
বেঙ্গল বুক কোম্পানী,
কলিকাতা।

মূল্য ছয় আনা।

প্রিন্টার—
শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
গিরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৫১।২।৬, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

# পুরাতন কথা

ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে বাঙ্গালীর মনীষা, গত উণবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল, ফরাসী কোমতের তন্ত্রের অনুরাগী হইয়াছিল। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র হইতে খিদিরপুরের ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ পর্য্যন্ত বড় বড় মেধাবী ও মনঃস্বী বাঙ্গালী কোমৎ-তন্ত্রের প্রচারক ও প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। এমন কি ভূদেব, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় কবি, লেখক ও ব্যাখ্যাতা কোমতের ভাবে বাঙ্গালীর আধুনিক সাহিত্যকে যেন অনেকটা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাঁহাদের মনীষা ব্রাহ্ম-সমাজের Eclecticism বা চয়নবাদে পরিতুষ্ট হইত না, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে তাহাদের অনেকেই কোমৎ-তন্ত্রের অনুরাগী হইতেন। ইঁহাদের অনেকেই কোমৎ-তন্ত্রের বেদীর উপর দাড়াইয়া বাঙ্গালীর সামাজিক উৎসব-পূজা প্রভৃতির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। ভূদেব এ পক্ষে প্রথম পথ প্রদর্শক ও অগ্রণী ছিলেন। দ্বারকানাথ ও ভূদেব কোমৎ-শিষ্য ইংরেজ ডাক্তার কঙ্গ্রীভের সহিত রীতিমত পত্রব্যবহার করিতেন এবং তাঁহারই

ভাব বাঙ্গালা গদ্যে পরিণত করিয়া বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিতেন। পরে এই ব্যাখ্যানের কাজ অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদার যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সাহচর্য্যে করিতে থাকেন। এইটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, ভূদেব শেষ জীবনে শাস্ত্রার্থ ও হিন্দুর সমাজ-ধর্ম্ম ঠিকমত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং যৌবনের স্বীকৃত সিদ্ধান্তসকলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ-পুস্তকসকলে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কোমৎ-তন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই Rationalistic বা প্রাকৃতবাদের সূত্র ধরিয়া অনেকেই বাঙ্গালীর নিত্য ও কাম্য কর্ম্মসকলের ব্যাখ্যা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব" বা অনুশীলন তত্ত্বের বহি এই হিসাবেই লেখা; তাঁহার "আনন্দ-মঠ", "দেবী-চৌধুরাণী" এবং "সীতারাম" জাতিবৈরের মসলায় তিন স্তরের অপূর্ব্ব তিনটি চিত্র মাত্র। মোট কথা এই, বঙ্কিমযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য কোমৎ-তন্ত্রের ভাবে ও সিদ্ধান্তে যেন ওতঃপ্রোতোভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। কোমতের Humanitarianismএর তিনটি স্তর Rationalism, Eclecticism এবং Transcendentalism অর্থাৎ বিশ্বমানবতার প্রাকৃতবাদ, চয়নবাদ এবং ভাববাদ বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার সহচর ও সহযোগী মনীষিগণ বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজকে নানা আকারে এবং নানাবিধরূপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঊণবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগের ফরাসী ভাবপ্রভাব পুরামাত্রায় যে এড়াইতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা বলিতে পারি না। "সাধারণী" সাপ্তাহিক সমাচার পত্রে প্রতি বর্ষে পূজার সময়ে,

অব্যাহতভাবে প্রায় বাইশ বৎসর কাল তিনি দুর্গোৎসব সম্বন্ধে অপূর্ব্ব প্রবন্ধসকল লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার গোড়ার অনেকগুলি কোমৎ-তন্ত্রের সিদ্ধান্তে পূর্ণ; বঙ্কিমচন্দ্রের ধারায় অনুস্যূত। কিন্তু পরে যখন ইন্দ্রনাথ এবং তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিলেন যে, কর্ম্মপ্রভাবে জাতির বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়, এবং এই বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে না পারিলে Nationalism বা জাতিত্ব ফুটিয়া উঠে না, এবং ন্যাশনালিজমের রীতিমত উন্মেষ না ঘটিলে পরে Humanitarianism বা বিশ্বমানবতার ভাব হৃদয়ে জাগে না, তখনই তাঁহারা উভয়ে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং কর্ম্মবাদের প্রচারক হইয়াছিলেন। কর্ম্মবাদ বুঝিতে এবং বুঝাইতে উদ্যত হইয়া আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস-কথা মন্থন করিয়াছিলেন। সে অনুসন্ধানের ফলে তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথ একটা নূতন ভাব-জগৎ দেখিতে পান। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সে অপূর্ব্ব-দর্শনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রৌঢ়কালের লিখিত দুর্গোৎসব সম্বন্ধের প্রবন্ধসকলে সে পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার, বঙ্কিমযুগের এবং ব্রাহ্মযুগের বাঙ্গালার ভাবপরম্পরার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার এখন মানুষ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কোন্ ভাব-প্রেরণায় মাইকেল বাঙ্গালার মহাকবি, কেন তিনি মেঘনাদ, ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন,—কাহার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রের কবিতাবলী এবং বৃত্রসংহার রচিত হইয়াছিল,—কোন্ অপূর্ব্ব সামগ্রীর আমদানীর চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রচার করেন, অমূল্য ও অতুল্য উপন্যাস সকল লিখিয়া যান,—আর কোন্ ভাব-দ্বন্দ্বে সঞ্জীবিত হইয়া রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, নীলকণ্ঠ,

চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অতিরথ, মহারথ প্রতিভাশালী লেখকগণ সন্দর্ভে-নিবন্ধে, ব্যাখ্যায়-বিবৃতিতে বাঙ্গালী জাতিকে ভাসাইয়া—মাতাইয়া গিয়াছেন,—কিসের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কোচ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম সাহিত্যের নির্ব্বাণ সাধন হইয়াছে,—এ সকলের ইতিহাসকথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার কেহ নাই। সে পরিশ্রম স্বীকার করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। সে অপূর্ব্ব, অসাধারণ এবং অতুল্য ভাব ও ভাষা ইংরেজি আমলের বাঙ্গালী লেখকগণ গত শতাব্দীতে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন এখন উপেক্ষার অন্ধকূপে ডুবিতেছে। তাই আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের জীবনের পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম-জাত দুর্গোৎসব সম্বন্ধে অপূর্ব্ব রচনাসকল মন্থন করিয়া, বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অজরচন্দ্র সরকার এই ভাবমঞ্জুষার সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাকে ইহার মুখবন্ধস্বরূপ কিছু লিখিতে বলা হয়। এ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত কিছু লিখিতে হইলে বঙ্কিমযুগের বাঙ্গালীর ভাবপরম্পরার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হয়। প্রথমে দেখাইতে হয় রাজা রামমোহন রায় কোন্ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, সে ভাব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র কি আকারে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম-সাহিত্যের বনীয়াদ তৈয়ারী করেন, তাহারই পাল্‌টা জবাবে ভূদেব, মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কেমন এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের উন্মেষ ঘটাইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষাকে কতটা প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল আদর্শ ফুটাইয়া যান। সামান্য একটা মুখবন্ধে এত কথা বলা চলে না। তাই আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের রচিত এই দুর্গাতত্ত্ব-মঞ্জুষার ঢাক্‌নী কোন্ ভাবচাতুরীর সাহায্যে উন্মুক্ত করিতে হইবে,

তাহারই ইঙ্গিত দিলাম মাত্র। কোমৎ-তন্ত্র এবং বাঙ্গালার সনাতন এবং পুরাতন সমাজধর্ম্ম ও তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে এই সকল প্রবন্ধের প্রকৃত মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তখনকার ব্রাহ্মসমাজের ভাবতরঙ্গ কেমন ভঙ্গীতে উত্থিত হইত তাহা না জানিলে এই সকল প্রবন্ধের কাকু ও দ্যোতনা কেহ উপভোগ করিতে পারিবে না। এ যে পাল্টা জবাব, কিসের এবং কাহাদের পাল্টা জবাব, তাহা জানিতে এবং বুঝিতে হইবে? হিন্দুয়ানীকে বা Hindu cultureকে বঙ্কিমযুগের মনীষিগণ কোন্ উপায়ে এবং কোন্ ভাবে ইয়োরোপীয় শিক্ষা-সাধনা বা cultureএর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেকটা সার্থক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রবন্ধ-পরম্পরায় প্রকট আছে। ভাবুক, রসিক, অভিজ্ঞ পাঠকগণ, যাঁহারা এখনও গত আশী বৎসরের বাঙ্গালার ভাব পরম্পরার বিন্যাস ভঙ্গী ভুলেন নাই, এখনও অবহেলার জড়তায় সে সকলকে বিস্মৃতির আবরণে ঢাকিয়া ফেলেন নাই, তাঁহারা,—কেবল তাঁহারাই ইহার প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। এই সে দিন আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের স্বর্গারোহণ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম, তাঁহার কর্ম্ম যেন বিস্মৃতির শীতল ও অগাধ জলে ডুবিয়া যাইতেছে। শ্রীমান্ অজরচন্দ্র এই প্রবন্ধপুস্তকখানি ছাপাইয়া পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিলেন। আর আমি, এই কয়টা কথা মুখবন্ধের স্বরূপ লিখিতে পাইয়া জীবন ধন্য বোধ করিলাম।

যাইবে কি মা,—এই মহামোহের মহাজাড্য অপসারিত হইবে কি? যে বাঙ্গালী তোমাকে জগদারাধ্যা জগদ্ধাত্রীতে পরিণত করিয়াছিল, মৃন্ময়ী রূপশালিনী তুমি,—তোমার চিন্ময় রূপের বিভা শব্দশক্তির সাহায্যে

ফুটাইয়া বঙ্গভূমিকে সমালোকিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে চিনিবার এবং চিনাইবার চেষ্টায় তাহাদেরই বংশধর ও সৃষ্টিধরগণ আবার সম্বুদ্ধ হইবে কি? এ সাধ পূর্ণ হইবে কি না জানি না!—এই সাধ পূর্ণ করিবার বাসনায় অনন্তের তীরে দাড়াইয়া এই পিতৃপক্ষের দিনে শ্রদ্ধার এই তিলাঞ্জলি দিলাম।

কলিকাতা,<br>৯ই আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

# মহাপূজা

## শারদীয়া মহাপূজা

১

বঙ্গে দুর্গোৎসব—অন্ধকারে প্রদীপ, অকূলে দ্বীপ, মরুভূমে শ্যামল ক্ষেত্র, গহনে পর্ণকুটীর। বঙ্গে দুর্গোৎসব—সুষুপ্তিতে সুখস্বপ্ন, তামসে তড়িৎসঞ্চার, নিশীথে রণবাদ্য, নীরবে রব, নিস্তেজে তেজ, নিরুৎসাহে উৎসাহ। দুর্গোৎসব বাঙ্গালির ভরসা।

দুর্গোৎসব দুর্ব্বল বঙ্গশরীরে বল-সঞ্চার। তুমি মহাজ্ঞানী নব্য সম্প্রদায়, তুমি বলিবে দুর্গোৎসব বল-সঞ্চার নহে—ইহা রোগ-সঞ্চার! দুর্গোৎসব জ্বরভোগ। আমি তাহা স্বীকার করি। যতদিন জ্বর আসিতেছে, যাইতেছে, ততদিন মৃতপ্রায় বঙ্গের জীবনের আশা আছে, ভরসা আছে; বাঙ্গালির ভরসা আছে। হে মহাজ্ঞানিন্, মহাবৈদ্যবৎ এ জ্বর বিচ্ছেদের চেষ্টা করিও না। দুর্গোৎসবই বাঙ্গালির আশা, এ আশা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিও না।

বাঙ্গালির আর আছে কি ? আর কিছুই নাই। বাঙ্গালি যথার্থই পথের কাঙ্গালি। বাঙ্গালা আজি কত শত বৎসর দলিত, প্রদলিত, পীড়িত, নিষ্পীড়িত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও সন্তান-বিপ্লবে বাঙ্গালা অসভ্যভূমি হইয়াছিল, অনার্য্য-আবাস হইয়াছিল, বঙ্গ প্রায় ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছিল ! আদিশূর ব্রাহ্মণ-স্থাপন করিতে না করিতে, তেজোহীন বঙ্গে তেজ-সংযোগ করিতে না করিতে, প্রবল মুসলমান-ঝাত্যায় বঙ্গের দীপ নির্ব্বাণ হইল ; একে একে নির্ব্বাণ হইল। বাঙ্গালা এখন অন্ধকার,—তেজ নাই, আলোক নাই, শোভা নাই, কান্তি নাই। বাঙ্গালা নিশীথ অন্ধকারের অন্ধনিবাস। এই অন্ধকারে চপলাচমক দেখিলে হৃদয় আশ্বাসিত হয়। বঙ্গের দুর্গোৎসব সেই চপলা-চমক, দুর্গোৎসবে বঙ্গবাসীর মন আশ্বাসিত হয়। এখনও বাঙ্গালার ভরসা আছে। তবে—'নাচ্ রে বঙ্গের লোক দু'বাহু তুলিয়া।'

বঙ্গবাসিন্, আপনি প্রেতপক্ষে যে তর্পণ করিয়াছেন, তাহার অর্থ জানেন ?

"আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহোদয় ॥
অতীত-কুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
আব্রহ্ম-ভুবনা-লোকাদিদমস্তু তিলোদকং ॥"

এই শ্লোকদ্বয় উচ্চারণ করিয়া আপনি যাঁহাদের তৃপ্তিসাধন-জন্য তিলোদক অর্পণ করিয়াছেন, একবার স্মরণ করুন দেখি তাঁহারা

কে ? সেই অতীত কুলকোটিমধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, পার্থ, ভোজ, পুরু, শিলাদিত্য, একাধিক বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ কীর্ত্তিকুশল বীর-বীর-মহাবীর আছেন। সেই অতীত কুলকোটি-মধ্যে বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস—সকলেই আছেন। সেই অতীত কুলকোটিমধ্যে বরাহ-মিহির, ভাস্কর, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্। সেই অতীত কুলমধ্যে বেদ-গাথক মহর্ষিগণ, অগাধতত্ত্বদর্শনকারগণ আছেন। বঙ্গবাসিন্, তুমি যতই হীনবীর্য্য, ক্ষীণপ্রভ হও না কেন, এই অতুল কুলকোটি-মানবের তুমি তর্পণাধিকারী। ইহা তোমার বড় অল্প গৌরবের কথা নহে।

প্রেতপক্ষে তর্পণের কথা স্মরণ করিলে, এখন একবার দেবীপক্ষে মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।

অশক্ত বঙ্গবাসী মহাশক্তির আরাধনা করিতেছে, দেখিতে চমৎকার। বুঝি বঙ্গবাসী তর্পণের পর পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করিতেছে, তাহাতেই সেই পিতৃপুরুষের গৌরবের মূলীভূতা মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল।

হৃদয়ে বল সঞ্চার কর। অন্ধকারে আলোকাগম হইতে দাও। মহাশক্তির আরাধনা কর। নিস্তেজে তেজ আনয়ন কর। বল—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমোনমঃ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দীপ্তিরূপেণ-সংস্থিতা
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমোনমঃ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শোভারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমোনমঃ ॥"

এইরূপে মহাশক্তির উদ্বোধন আরম্ভ কর। যদি কখন নিদ্রিতা দেবী প্রবুদ্ধা হয়েন, অবশ্য তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে।

২

মা! জগদম্বে! নারায়ণাবতার শ্রীরামচন্দ্র আপনার গৃহ-লক্ষ্মীকে রাক্ষস-হস্ত হইতে উদ্ধারকরণ-জন্য অকালে তোমার অর্চ্চন করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা-করণার্থ নীল পদ্ম হরণ করিয়াছিলে। তোমার প্রীতিসাধন-জন্য কমললোচন নিজ নয়নোৎপাটন করিয়া তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলে। মা! তুমি মহাশক্তি, তোমার অনন্ত লীলা, তোমার কঠিন পরীক্ষা।

মা! আমরা ক্ষুদ্র জীব তোমার রুদ্রশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; বল মা, আমরা কি দিয়া তোমার পূজা করি? তোমার অনন্ত লীলা—তুমি সিংহবাহিনী; শ্বেত-সিংহে ভর করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব-হরণ করিয়াছ; বল মা, তবে এখন কি দিয়া তোমার পূজা করি? ভারতবাসী এখন জন্মান্ধ; চক্ষু নাই যে চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তোমার প্রীতিসাধন করিবে।

কায়, মন, অন্তঃকরণ—সকলই সেই সিংহের সেবায় অর্পণ করিয়াছে। বল, মা সিংহবাহিনি, এখন কি দিয়া তোমার পূজা করিব ?

শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই, বল নাই, বুদ্ধি নাই, তবু মা তোমার পূজা করিব। আমাদের দুইটি নিজস্ব আছে,—দুঃখের কান্না, আর সুখের আলস্য। আমাদের অগাধ শোকসিন্ধুর সেই উচ্ছ্বাস-লবণাম্বুতে তোমার চরণ প্রক্ষালন করিব,—সেই লবণাম্বু-মার্জ্জিত শূন্য হৃদয়পীঠে তোমাকে বসাইব,—সেই লবণ-নীর-আসারে তোমার অভিষেক করিব,—আর সেই চিরসঞ্চিত আলস্যকে তোমার সম্মুখে বলিদান করিব। বল মা! তুমি কি বাঙ্গালির এই অভিষেকে উদ্বুদ্ধা হইবে ? এই পূজায় পরিতৃপ্তা হইবে ? মহাশক্তি! যদি ইহাতে তোমার তৃপ্তি না হয়, "শক্তিং দেহি ক্ষণে ক্ষণে"—ষোড়শোপচারে তোমার পূজা করি।

৩

আবার অশক্ত বঙ্গবাসী মহাশক্তির আরাধনা করিবে; আবার ধাতুবংশী আপনার এলায়িত বেহাগ ভুলিয়া "ও মা দিগম্বরি নাচ গো, মা, রণমাঝে"—বলিয়া বীররসের অবতারণা করিবে; আবার সেই বিরাট্ ঢক্কা এবং ঢোলের চক্কা, সেই জগঝম্প ও মহাদম্ফ একত্র সংমিলিত রব করিয়া বঙ্গবাসীর স্রোতোহীন হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিবার চেষ্টা করিবে; আবার বহুদিন পরে কঠোর শ্রমজীবী অন্ততঃ চারিদিনের তরে শ্রম

হইতে মুক্তি পাইবে; দুর্ভাগা মসীজীবী আবার একবার কিছুদিনের জন্য মসীপেষণ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

আবার প্রবাসী প্রেয়সীর প্রীতি, বালকের আধ-অমৃত-ভাষা, জননীর স্নেহ, প্রতিবেশীর সদালাপ চিন্তা করিতে করিতে সুখের শারদ লহরে বহর ভাসাইয়া ভবনাভিমুখে চলিল; আবার একবার সেই বঙ্গের নবোঢ়া তরুণী বধূ শিবিকাযানে শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়া স্বামিসমাগম-প্রতীক্ষায় ঘটিকাযন্ত্রবৎ ক্ষণশব্দিত হৃদয়ে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল; আবার বঙ্গের বালবিধবা উষ্ণশ্বাস ত্যাগ করিল ও কুলীনকন্যা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিল।

আবার প্রবঞ্চক পূজক, আত্মহিতরত পুরোহিত, অনধীত-শাস্ত্র অধ্যাপক ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার চণ্ডীপাঠী বিপ্র “রূপের” উপর “রূপ” পাঠ করিয়া আপনার ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থসঞ্চয় করিতে লাগিলেন; আবার বসনব্যবসায়ী—এক হস্তে বস্ত্র অন্য হস্তে অস্ত্র লইয়া আপনার কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল;—অস্ত্রে কখন বিক্রীত বসন কাটিয়া দেয়, কখন বা ক্রেতার গলদেশ-উদ্দেশে প্রদান করে। কলিকাতার চাঁদনীর চক্ এমন দিনে একবার উপানদ্বাদ্য করিয়া পল্লীগ্রামের ক্রেতাদিগকে অভি-বাদন করিল।

বাঙ্গালার চিরসঙ্গী চিরশত্রু দলাদলি এমন দিনে একবার সময় পাইয়া হলহলা করিয়া উঠিল, আর সমাজের নিষ্কর্ম্মা,

বিশকর্ম্মাগণ তাহার সাহায্যকরণার্থ দ্বেষ-হিংসা লইয়া সমরাঙ্গনে অগ্রসর হইল। বাঙ্গালির ভগ্ন কপাল ক্রমে এইরূপে চূর্ণ করিতে লাগিল।

৪

এস মা মহাশক্তি, তোমার আরাধনা করি। এমন দুর্দ্দিনে দুর্গে তোমার দৈব শক্তি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই, তবু মা, তোমার উদ্বোধনে যোগদান করিতে আমাদের সাহস হয় না। রুদ্ররূপিণি, তুমি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের উপর নিতান্ত নির্দ্দয়। এই পুণ্যভূমিতে যখন তেজ ছিল, বল ছিল, তখন মা, তুমি এখানে একভাবে ক্রীড়া করিতে, আর আজ সেই পুণ্যক্ষেত্র নিস্তেজ, নির্জীব জীবশ্রেণীতে পূর্ণ দেখিয়া তীব্র পীড়ারূপে বিরাজ করিতেছ! তাই মা, তোমার উদ্বোধনে যোগদান করিতে আমাদের সাহস হয় না।

মা, তুমি তোমার মহাদেবের মনোরঞ্জন-জন্য হিমালয়ের রম্য উপবন—এই ভারতক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছ; সর্ব্বনাশিণি! তবে তোমার হিমালয়কে কেন তাঁহার অঙ্গজের সহবাসী কর না! হিমালয় সাগর-গর্ভে বিলুপ্ত হউক, ও কলঙ্কচূড়া দিনকরের করস্পর্শে আর যেন জ্বলিয়া না উঠে! মহাকালজায়া, এখন তোমার মনস্কামনা সর্ব্বথা সিদ্ধ হউক, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

পাহাড়ের মেয়ে, ভাঙ্গড়ের জায়া, এই লক্ষ্মীছাড়াদের

জননী—তোমার কাছে অভিমান করা এখন অরণ্যে রোদন। তুমি সৃষ্টি রক্ষা করিলে কি তোমার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না? তবে দুর্গে! এই শ্যামল সংসার ছারক্ষার করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে এত ব্যগ্র হও কেন? উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—চারিদিকে হাহাকার; ঘোররাব শিবারবে, সদ্যো-মৃতের শবশরীরে, কঙ্কালাস্থিমালায় এই মহাশ্মশান পরিপূরিত হইয়াছে, কঠোর কর্কশ আর্ত্তনাদে আকাশমার্গ, গিরিগুহা,—দেবমন্দির পর্য্যন্ত শব্দিত হইতেছে, তবু কি তোমার ত্রিশূলীয় মনস্তৃপ্তি হয় নাই? একেই কি বলে দেবতার লীলা? মহাষ্টমী দিনে দুই কোটি বাঙ্গালি উপবাসী থাকিয়া গৃহে গৃহে তোমার পূজা দেয়, সেই একপ্রাণ ভক্তগণের সর্ব্বনাশ সেই আরাধ্যা দেবী করিবেন না ত কে করিবে? দেবি, তোমার অনন্ত লীলা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এত' নিগ্রহেও নিরাশ হইব না। শ্মশানে সংহাররূপিণীর পূজা করিব। তোমার অনন্ত লীলা বুঝিতে পারি নাই,—দেখি মা! তুমি আমাদের এই অনন্ত ভক্তি বুঝিতে পার কি না?

তবে এস ভাই বঙ্গযুবক, আয় ভাই পাঠশালার বালক, এস গো গৃহের কুললক্ষ্মীরা, আসুন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসুন, আসুন গুরুজনগণ আসুন, আয় খোকা আমার কোলে আয়, যাদু মাদু কাঁসর ঘণ্টা লও, বাজা ভাই বাজন্দরে—ধর ভাই সানায়ে তান, ডাক্‌রে জগদম্বা ব'লে, আয় রে বাজারের বেশ্যা সঙ্গে নাচিতে নাচিতে,—এ সুখের দিনে মন খাট' ক'রে তোরেও

ছেড়ে যাব না—বলে বলিবে লোকে মন্দ, আমরা আর কারও কথা শুনিব না। বাঙ্গালার এক প্রাণী ছাড়িব না। বালক-বৃদ্ধে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে, কুলবধূ-কুলটায়, জ্ঞানি-মূর্খে, ধার্ম্মিকে পাপিষ্ঠে, শাক্ত-বৈষ্ণবে, ব্রাহ্ম-নাস্তিকে—সকলে একত্র হইয়া কুলপ্লাবিনী গঙ্গার কূল হইতে আজি মঙ্গলঘট পূর্ণ করিয়া আনিব। আর এই বিস্তীর্ণ বঙ্গ-বেদীতে স্থাপন করিয়া নিঃস্বার্থমানসে, নিষ্কামহৃদয়ে মহাশক্তির আরাধনা করিব। সেই সিংহবাহিনী, অসুরঘাতিনী, দশবিধ-প্রহরণহস্তার ধ্যান করিব, সেই বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর, কমলালয়া লক্ষ্মীর রাতুল চরণ সন্দর্শন করিব, সেই বিঘ্নবিনাশনের ফুৎকার-বৃষ্টিতে সৃষ্টিরক্ষার কথা ভাবিয়া দেখিব, আর সেই দেবসেনাপতির দিব্যধনুর্ব্বাণ কত কাল নিস্পন্দিত থাকিবে, তাহারই চিন্তা করিব!

তোমার উদ্বোধনে সাহস হয় নাই, তবে বল মা সিংহ-বাহিনি! কি দিয়া তোমার পূজা করি?

হে সত্ত্বরজস্তমোময়ি, তামসিক পূজা করি—সে অর্থ আমাদের নাই; রাজসিক পূজা করি—সে বল আমাদের নাই। তবে মা, এই কাঙ্গালিদের এই সাত্ত্বিক পূজা গ্রহণ কর। দেখি মা, আমাদের এই অনন্ত ভক্তি তুমি কতকাল বুঝিতে না পার।

তবে বাজা ভাই বাজন্দরে তাক্ তাক্ সিন্ তাক্; বাজা ভাই কাঁসিদার ঝিনাক্ ঝিনাক্ ঝাঁ। নেচে আয় সুকুমারীগণ তোরা আগমনী গাইয়া। আর কাহার কথা শুনবো না।

সবেমিলে বাহুতুলে, উচ্চরোলে গণ্ডগোলে—আয় সকলে মিলিয়া ডাকি—জয় জগদম্বে, জয় জগদম্বে মা ! মা, নিঃস্বার্থ মানসের, নিষ্কাম হৃদয়ের সাত্বিক পূজা গ্রহণ কর। পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে দেবতারা যেরূপ ভয়ভক্তিসহকারে অপরিজ্ঞেয়া শক্তির উপাসনা করিয়াছিলেন, অদ্য শত সহস্র বৎসর পরে এই সকল ক্ষুদ্র জীব সেই অপরিজ্ঞাতার লীলামর্ম্ম সেইরূপ বুঝিতে না পারিয়া তোমার অস্ফুট আরাধনা করিল।

৫

চল মা, তোমাকে জলে দিয়া আসি। একাদিক্রমে তিন দিবস মহাশক্তি, তোমার আরাধনা করিয়াছি—কলিকালে বঙ্গবাসী আর পারি না, মা ! চল তোমাকে জলে দিয়া আসি। আমরা মর্ত্ত্যবাসী, যেমন দিয়াছি, তেমনই পাইয়াছি ; কিন্তু তোমরা দেবতা—তাই বলিয়া তোমাদের বেলায় কি ঐ নিয়মেব অন্যথা হইবে ? তোমরাও যেমন দিয়াছ, তেমনই পাইবে,—বাঙ্গালির দেহে যে বল দিয়াছ, মনে যে শক্তি দিয়াছ, তাহাতে বৎসরের মধ্যে মা, তুমি তিন দিন পূজা পাইতে পার ; কোন-রূপে সেই মহাপূজা সমাপন করিয়াছি, চল এখন তোমায় জলে দিয়া আসি।

বলিতে কি তিন দিন তোমার আরাধনা করা—তাও আমাদের আর পোষায় না। আমরা বৎসর বৎসর শক্তির আরাধনা করিয়া ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি ; এই

তিন দিন না যাইতেই জ্বর, বিসূচিকা, উদরাময়রোগে দুর্ব্বল বঙ্গবাসী অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, আর নয়,—চল মা, তোমায় জলে দিয়া আসি।

মা সিংহবাহিনি, অসুরঘাতিনি, দশভুজে! মা, তোমার ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিবার আর আমাদের ক্ষমতা নাই। শক্তি-রূপা নারীর হস্তে অসিচর্ম্ম, ধনুঃশর—মা, এখন পুর্য্যুগের কথা, কবির কল্পনা। তোমার আরাধনা করিতে গিয়া তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলাম না। চল মা, তোমাকে জলে নিমজ্জন করিয়া আসি।

দুর্ব্বলের বল পরীক্ষা করা দেবতার লীলা। নহিলে ভারতবর্ষের এত ভূভাগ থাকিতে অশক্ত বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে মহাশক্তির মূর্ত্তি কেন? দেবতার লীলা, শুনিতে পাই, দেবতাতেও বুঝিতে পারেন না—তবে আমরা কিরূপে বুঝিব? বঙ্গবাসীর দুর্গোৎসব-লীলাভিনয়ে আমরা বুঝিতেছি—শক্তি, ভক্ত উভয়েই বিড়ম্বিত হইতেছেন। আমাদের এ দুর্ব্বল শরীরে, দুর্ভার মানসে মহাশক্তি, তোমার পূজা করা বিড়ম্বনা মাত্র; আর মা, তুমি নররক্তমাংসপ্রিয়ে—আমাদের পঞ্চোপকরণের দীন আয়োজন, ক্ষীণ ছাগ এবং মীনমুণ্ড—এ সকল তোমার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র—চল মা, উভয়ের অবসান করি, তোমায় বিসর্জ্জন দিয়া আসি।

৬

আমাদের মত নির্ব্বোধ জাতি আর নাই ; আবোধন করিয়া, আমন্ত্রণ করিয়া কত কষ্টে মহাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিলাম—অমনই তিন দিন না যাইতেই দক্ষিণান্ত করিয়া আবার নিশ্চিন্ত হইতে চাই। মহাশক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া মহাশান্তি লাভ করিতে যাই। ভোলানাথকে স্মরণ করিয়া মহাশক্তির বিয়োগ-যন্ত্রণা একেবারে ভুলিতে চাই।

কোন্ কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছ ভাই! যে শান্তির জন্য ব্যস্ত হইয়াছ ? সিদ্ধি খাইয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছ ? রামচন্দ্র ঐ দশমীর দিনে আপনার শত্রু-নিপাত করিয়াছিলেন,—তিনি তখন শান্তি-জলের প্রয়াসী হইতে পারেন, সকলের সহিত প্রীতির আলিঙ্গন করিতে পারেন, স্বকার্য্য-সমাধান্তে সিদ্ধিতে বিভোর হইতে পারেন। তুমি কি করিয়াছ ভাই ? তিন দিন আনন্দময়ী গৃহে ছিলেন,—এই রোগ শোক পরিতাপের মাঝে তবু কত আনন্দ ছিল, কত উৎসব ছিল, কত উৎসাহ ছিল, সেই আনন্দময়ীকে সকলে মিলিয়া জলে দিয়া আসিলে—কোন্ আহ্লাদে হাস্য করিতেছ ? কোন্ প্রাণে পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছ ? রাবণের চিতা আমাদের হৃদয়ের ভিতর জ্বলিতেছে—আমাদের আবার শান্তি কি ? আমাদের আবার আহ্লাদ কি ? মহাশক্তির পূজা যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে—তুমি বলিবে সেই আহ্লাদেই আহ্লাদ। আমি বলি, যে বলে

কলিকালে ভারতবাসীর পূজা সমাপন হইয়াছে—সে নির্ব্বোধ, দুর্গোৎসব কাহাকে বলে সে বুঝে না।

আমাদের এ মহাপূজার সঙ্কল্প আছে, দক্ষিণান্ত নাই,—এ মহাব্রতের প্রতিষ্ঠা আছে, উদ্‌যাপন নাই। আবার বিজয়াতে সঙ্কল্প কর, সম্বৎসর আয়োজন কর, 'আর' বৎসর কঠোর ব্রত করিবে। এইরূপে যদি বর্ষ পরে বর্ষ—ক্রমাগত মহাশক্তির আরাধনা করিতে পার, তবে এ মহাপূজায় প্রবৃত্ত হও। এ নিষ্কাম ব্রতের উদ্‌যাপনও নাই, দক্ষিণান্তও নাই।

৭

যে মহাশক্তির আবির্ভাবে বঙ্গবাসী সম্বৎসর পরে একবার উৎসাহে উৎসবে উছলিয়া উঠিয়াছিল, যে শক্তির সঞ্চারে বঙ্গবাসী ক্ষীণ প্রাণে একটু বল পাইয়াছিল, যে শক্তির গৌরব-রক্ষার্থ দণ্ডনেতা শাসক-সম্প্রদায় কয়দিনের তরে শাসন-দণ্ডের বিশ্রাম দিয়াছিলেন এবং হতভাগা কেরাণীদল আপনাদের গাত্রবেদনা বিস্মৃত হইয়া উৎফুল্লমনে উৎসবে মাতিয়াছিল, যে শক্তির উৎসব-উপলক্ষে নবপ্রণয়িনী একবার প্রিয়সমাগম লাভ করিয়া আনন্দে সুখের কয়দিন দেখিতে দেখিতে কাটাইয়াছে, সামান্য পণ্যজীবী হইতে বড় বড় বণিক্ পর্য্যন্ত যে শক্তির আরাধনা-উপলক্ষে আশানুরূপ অর্থ সঞ্চয় করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছে, অতি দীনদুঃখীও যে মহাশক্তির করুণাবলে কয়দিন উদর পুরিয়া খাইয়াছে, শীর্ণকায় বালক-

বালিকাদিগকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইয়াছে—মৃত বঙ্গে ক্ষণ-জীবন-সঞ্চারিণী সেই মহাশক্তি পুনরায় নিরঞ্জনে লীন হইয়াছেন। বিদ্যুদ্দীপন এবং বজ্রবিঘোষণের পর বঙ্গের চির অন্ধকার যেন ঘনীভূত হইয়াছে; মহাশ্মশানের ক্ষীণ শব্দ আপনার ক্ষীণতাতেই যেন ভীতি উৎপাদন করিতেছে।

বাঙ্গালির বড় সাধের দুর্গোৎসব দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। বিজয়ার পর দূরদেশাগত আত্মীয়-বন্ধুসকলের পরস্পরের প্রেম-আলিঙ্গন-সুখ, প্রণয়-সম্ভাষণ ফুরাইয়া গেল। বহুদিন হইতে দাসত্বে জর্জ্জরিত ক্ষীণবল বাঙ্গালি-সন্তান যে সুখের ছুটীর প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছিলেন, এখন সে সুখের ছুটী, সে উৎসবের দিন ফুরাইয়া গেল,—সকলেই আপন আপন কর্ম্মে পুনঃ প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রবাসী চাকুরে বাঙ্গালি দুঃখিতান্তঃকরণে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রীপুত্র সকলের নিকট কিছুদিনের জন্য বিদায় লইতেছেন। ছাত্রগণ যে এতদিন আনন্দোৎসবে মাতিয়া পরীক্ষার ভীষণ মূর্ত্তি ভুলিয়া সুখ-ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা আবার শীর্ণজীর্ণ কলেবরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী হইতে নিম্নতম শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকলেই আত্মীয়-বন্ধুর সহিত বিজয়ার সম্ভাষণ করিয়া আবার আপন আপন কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন।

আবার প্রবাসী অন্ন-চেষ্টায় দূরদেশে অবস্থিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে ডাক্‌হর্‌করার প্রতীক্ষায় স্বীয় মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতে থাকুন; আবার দাসত্বজীবী ভ্রাতৃকুল

শরীর, মন, মান, মর্য্যাদা প্রভুপদে বিক্রীত করিয়া অন্ন-সংস্থানে একান্তমনে ব্যাপৃত থাকুন; আবার বৈদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ বিচার বিক্রয় করিতে, অত্যাচার বিলাইতে, সদাচারের অভিনয় করিতে এবং কদাচার নিবারণ করিতে যত্নবান্ থাকুন; আবার তাঁহাদের হস্তধৃত শাসনদণ্ড দীন-দুঃখী, কাঙ্গাল-গরীব এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধনবান্—সকলের শিরোদেশে সমভাবে উত্তোলিত থাকিয়া বৃটিশরাজের অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখুক; আবার হীনচেতা ক্ষীণধর্ম্মা বাঙ্গালি পদস্থের উপাসনা, অপদস্থের অবমাননা করত আপনাদের অসার জীবন সার্থক করিতে থাকুন; আবার অধার্ম্মিক উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গবাসী বঙ্গসমাজের নেতা বলিয়া পরিগণিত হউন, আর ধর্ম্মভীত লোকে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ শশব্যস্তে বাস করুন; এবং দেশ-হিতৈষিতার ধূয়া তুলিয়া অভীষ্টসিদ্ধিসাধন-প্রয়াসী কৃতবিদ্য যুবক আপনার নাম-গৌরব বৃদ্ধি করিতে পূর্ব্বমত যত্ন করিতে থাকুন।

৮

দেখিতে দেখিতে বঙ্গের শক্তিপূজা আর একবার ফুরাইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখময় জীবনের এক পর্ব্ব কাটিয়া গেল। পূজা ফুরাইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশা-ভরসা অতল জলে কিছু দিনের জন্য নিহিত হইল। পরাধীন বঙ্গবাসীর এমন সুখের দিন আর হইবে না। এই বিজাতীয়

পদদলিত-লাঞ্ছনা-কলঙ্কিত জীবনেও শক্তিপূজার নাম শ্রবণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়,—এই হতশক্তি জীবনে শক্তি-আরাধনার কথা উদয় হইলেও হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অন্তর দুরু দুরু কাঁপিতে থাকে। আজি সেই সুখের দিন শেষ হইল, যাবজ্জীবনের দারুণ দুঃখ দরিদ্র বাঙ্গালি-হৃদয়কে ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

কাহার দুঃখের কথাই বা বলিব? পরপদলেহী প্রবাসী বঙ্গবাসী পূজার তিন মাস পূর্ব্ব হইতে দিন গণিতেছিল, দুঃখে কষ্টে একটি আধটি মুদ্রা বাঁচাইয়া স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়-পরিজনবর্গের জন্য সাধ্যমত সুখের সামগ্রী আহরণ করিতেছিল, পূজা আসিবে ভাবিয়া হৃদয় আহ্লাদে মাতাইতে ছিল, ক্রমে সে সাধ ঘুচিল, আবার বদ্ধ জীবের অন্ধকূপ সম্মুখে উপস্থিত, সুখের কুয়াশা অন্তরে মিশাইয়া গেল। চিরপরাধীন জীবনে দু'দিন স্বাধীনতার বাতাস লাগিয়াছিল, আজি সে বাতাস সন্ সন্ শব্দে বহিয়া গেল, দাসত্ব সুলভ অঙ্গবেদনা দু'দিন একটু উপশম হইতেছিল, আজি পুনর্মুষিকত্বের প্রবল চিন্তাঘাতে বেদনা শতগুণ বাড়িল। অধিকন্তু দুর্ভাবনার শত বৃশ্চিক হৃদয়ের প্রতি স্তরে দংশন করিতে লাগিল। গুরুজনকে প্রণাম, বন্ধুজনকে আদর-আলিঙ্গন, সারল্যময়ী সহধর্ম্মিনীকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া উৎসবের পর উৎসাহে কোথায় বিদেশে গমন করিবে,—না সকলেই বদনে বিষাদের কালিমা মাখিয়া নয়নে শোকাশ্রু বর্ষণ

করিয়া শক্তি-বিসর্জ্জনের সঙ্গে অন্তরের ঈষদুন্মেষিত শক্তির বিসর্জ্জন দিল।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত কঙ্কাল-মাত্রাবশিষ্ট নির্ধন বঙ্গসন্তান মার শুভাগমনে একটু আশ্বস্ত হইয়াছিল, গললগ্নবাসে মার অভয় পদে জীবনের একটু শান্তি কামনা করিতেছিল, মার প্রসাদে দু'দিন যথেচ্ছা কাটাইতেছিল, আজি তাহার ক্ষণিক সুখ অন্তর্হিত হইল,—আবার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল,—প্লীহাপীড়নে অস্থির হইল; আবার কেহ বা বিজয়ার সঙ্গে জীবনের বিজয়া করিয়া 'স্নেহময়ী জননী' এবং 'প্রাণসখী প্রেয়সীকে কাঁদিয়া ধরাসন ভিজাইতে' রাখিয়া চলিয়া গেল।

হিন্দু ব্যবসায়ী কত যত্ন, কত পরিশ্রম করিয়া নিজ সম্বলের চূড়ান্ত সদ্ব্যয় করিয়া আপনার ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্যে দোকান সাজাইয়াছিল; এই সুখের পূজার সময় বেচাকেনা করিয়া বৎসরের শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিবে প্রতীক্ষা করিয়াছিল, আজি তাহার সুযোগ শেষ হইল। দীন, দরিদ্র, পথের কাঙ্গাল এই সুখের পূজায় উদর পূরিয়া খাইবে, দুই-চারিটি পয়সা পাইবে, এক বৎসর পরে পূজাবাড়ীতে একখানি নূতন বস্ত্র পাইয়া মনের উল্লাসে চিরচীরধারী দেহের শোভাবর্দ্ধন করিবে আশা করিয়াছিল, আজি তাহারও সে সুখের আশা ফুরাইল। এই পূজাগমে নির্ধন, কাতরহৃদয় বঙ্গবাসীর চিত্তকল্পিত সমগ্র সুখের সঙ্গম হইয়াছিল, আজি শক্তি-প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের সকল সুখ শত শত মুখে বিচ্ছিন্ন হইল।

তবে যা মা জগজ্জননি, শান্তিবিধায়িনি, দুর্গতিনাশিনি শক্তি! এই শক্তিহীন জীবনে বৎসরের তরে ভারতের একমাত্র সম্বল পবিত্রতোয়া গঙ্গাগর্ভে তোকে বিসর্জ্জন দিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করি। তোর নামে মা! সে কালের কথা স্মরণ হয়,—সেই সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের অমিত বিক্রম, অকৃত্রিম সৌভ্রাত্রস্নেহ, অনুপম প্রজাবাৎসল্য, দুর্লভ আত্মত্যাগের কথা মনোমধ্যে নিমেষের জন্য উদিত হয়,—সেই আর্য্যরক্ত এই দীন, হীন, মলিন দেহেরও ধমনীতে ধমনীতে মুহূর্ত্তের জন্য প্রধাবিত হয়, আর মা! তোর শক্তিনামের অপার মহিমায় এই চিরপরাধীন বাঙ্গালির হৃদয়ে একটু শক্তির সঞ্চার হয়। লোকে বলে মা, পুরাণেও শুনি মা, তোর মূর্ত্তিতেও দেখিতে পাই মা,—তুই অসুরদলনী, মহিষমর্দ্দিনী, পাষণ্ডবিঘাতিনী মহাশক্তি! কালহৃদিবিহারিণী কালী, জগৎ-পালিনী জগদ্ধাত্রী—কিন্তু কৈ মা! তোর সে শক্তি কোথায়? কালের অপ্রতিহত গতিতে তোর সেই মহাশক্তি কি একেবারে শক্তিহীন হইয়াছে মা? নচেৎ তোর এই অধম সন্তান একেবারে নীচাদপিনীচ-পদদলিত কেন হয় মা? তুই দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন কেন করিস্ না মা? যাই হউক মা, তুই বৎসরান্তে একবার এই অধম বাঙ্গালির গৃহে পদার্পণ করিস্, তবু মাসের জন্যও দাসত্বের জ্বালা এড়াইব, প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিব, স্ত্রী-পুত্রের, পিতা-মাতার, ভাই-বন্ধুর স্নেহ-পূর্ণ মুখ দেখিয়া অন্তর জুড়াইব, এই চিরবিধ্বস্ত বঙ্গভূমির

ক্ষণিক সুখের দশা দেখিব, আর মা! তোর বিমলানন্দদায়িনী মহাশক্তির বিষয় কল্পনা করিয়া এই দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলের দুরপনেয় কলঙ্ক ক্ষণেকের জন্যও হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিব।

---

# শক্তি-সেবা

## ১

বাঙ্গালির উৎসব সম্বৎসরের মধ্যে তিন দিন। সেই তিন দিন বাঙ্গালি একবার আপনার দুর্ভার জীবনের জড়তা পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠে। মহাশক্তির কি মহীয়সী মহিমা! তাঁহার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির আরাধনা-উপলক্ষে এহেন বাঙ্গালি-হৃদয়ও যখন নাচিয়া উঠে, না জানি তাঁহার জীবন্ত আবির্ভাবে ভারতবাসী পূর্ব্বকালে কি অপূর্ব্ব আনন্দই উপলব্ধি করিতেন!

বহুদিন, বহুযুগ, বহুকাল হইল আমরা শক্তি-সেবা পরিত্যাগ করিয়াছি, শক্তি-সেবা ভুলিয়াগিয়াছি, মহাযন্ত্রীতাড়িত জড়যন্ত্রবৎ নিয়ামকের সঙ্কল্প-সাধন-জন্য পরিচালিত হইতেছি। আমাদের গমনে লক্ষ্য নাই, আসনে স্থৈর্য্য নাই, কার্য্যে সঙ্কল্প নাই, বচনে নিষ্ঠা নাই, হৃদয়ে আবেগ নাই, যোগে এক-প্রাণতা নাই। তথাপি যে, মহাশক্তির ছায়া সন্দর্শনে আমাদের

জড়প্রাণ এখনও নাচিয়া উঠে, সেই আমাদের একমাত্র আশা এবং গুরুতর ভরসা।

## ২

নিরাশ্রয়ের তৃণাবলম্বনই ভরসা। যে মূর্ত্তিমতী কায়া দেখিবার আশা করে না, ধূমময়ী ছায়াই তাহার ভরসা। মহা-শক্তির ছায়াময়ী মূর্ত্তির উপাসনাই এখন আমাদের ভরসা। যে মহাশক্তির ক্ষণমাত্র ছায়া পাইয়া এই ছয় কোটি জড়জীব বাঙ্গালি আনন্দে উৎফুল্ল হয়, না জানি একবার তাঁহার সাক্ষাৎ-সন্দর্শন পাইলে আজি কি হয়! চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্বানর যাঁহার লোচনত্রয়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে যাঁহার সমান দৃষ্টি, ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধ কটাহ যাঁহার মস্তকের মুকুট, অনন্ত অন্ধকার যাঁহার আলুলায়িত চিকুরজাল, নক্ষত্রপুঞ্জ যাঁহার কেশকুসুম, যাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসে সমীরণ দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইতেছে, দশ দিক্ যাঁহার বাহু, গ্রহ-উপগ্রহাদি যাঁহার ক্রীড়া-কন্দুক, ক্রোধ যাঁহার গ্রীষ্ম, হুঙ্কার যাঁহার বজ্রনাদ, যাঁহার মৃদু হাস্যে বসন্ত বিভাসিত হয়, লোকপিতামহ ব্রহ্মা যাঁহার পূজক, মহাকাল যাঁহার সেবক, বেদ যাঁহার স্তুতিগানে অক্ষম, পুরাণ যাঁহার মহিমা-বর্ণন করিতে পারে নাই, বিজ্ঞান যাঁহার নির্ণয়ে স্পর্দ্ধা করে না, কল্পনা যাঁহার পদপ্রান্তে দূর হইতে প্রণাম করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য বলিয়া স্বীকার করে,—সেই মহাদেবী মহাশক্তির ধ্যান-ধারণা করিতে আমরা ক্রমে অশক্ত হইয়াছি।

সে আর্য্য-কল্পনা আর আমাদের নাই, হৃদয়ের সে আর্য্য-শক্তি আর নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই।—তাহার কিছুই নাই, তথাপি এখনও যে আমরা সেই মহাশক্তির ছায়া পাইয়া আনন্দে উৎসাহিত হই,—সেই আমাদের গৌরবের কথা। কিন্তু এই ছায়াই যে আর কতকাল থাকিবে, আর সেই মহাদেবীর মানসিকী মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া আমরাই বা তাঁহার ছায়া লইয়া কত কাল কাটাইব, তাহা কে বলিতে পারে!

৩

বর্ষ পরে বর্ষ যাইতেছে, অশক্ত বাঙ্গালি মহাশক্তির কেবলমাত্র জড়-উপাসনা করিতে করিতে দিন দিন আরও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

ভারতবর্ষের উপর দেবতার কোপদৃষ্টি বোধ হয় সর্ব্বত্রই সমান; তবে আমরা বাঙ্গালি, বাঙ্গালির দুর্দ্দশা আমরা চোখের উপর দেখিতে পাই, বাঙ্গালির দুর্দ্দশা আমাদের আপনাদের কথা, তাহাতেই আমরা বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালির দুঃখের কথার বার বার জল্পনা করি। এক একবার বোধ হয়, বাঙ্গালার উপর বুঝি বিধাতার বিশেষ কোপদৃষ্টি আছে।

বাঙ্গালার নদী সকল ক্রমেই শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে; ছাগ, গো, মহিষাদি দিন দিন দুর্ব্বল এবং দুগ্ধহারা হইতেছে; দেশব্যাপী, সম্বৎসর-ব্যাপী জ্বরে বাঙ্গালা ক্রমেই উৎসন্ন যাইতেছে; আর অভাগা বাঙ্গালি ক্রমেই ক্ষীণপ্রাণ ও হীনবল

হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজের রাজ্যের এই প্রগাঢ় শান্তি, আধুনিক সভ্যতাসঙ্গত এই শাসনপ্রণালী, এই শিক্ষাবিস্তার, আর এই দূরত্ব-নাশকারক লৌহপথে লৌহশকট, তাড়িৎবেগধারী টেলিগ্রাফ, জলপথে ধূমতাড়িত ষ্টীমার—কৈ কিছুতেই এই অধঃপতনশীল বাঙ্গালার অধোগতি রোধ করিতে ত পারিতেছে না। না, কিছুতেই কিছু হইতেছে না,—না হইবারই কথা। যে আপনার ভাল আপনি করিতে চেষ্টা না করে, ভগবান্ কখন তাহার ভাল করেন না। বাঙ্গালি আত্ম-চেষ্টায় একান্ত বিরত, তাহাতেই বাঙ্গালির এই দুর্দ্দশা!

৪

শক্তি-সাধনার প্রধান বীজ—আত্মচেষ্টা এবং আত্ম-নির্ভরতা। বাঙ্গালির তাহা নাই বলিলেও হয়। পরপ্রতিষ্ঠিত শক্তি-সমক্ষে বাঙ্গালি কৃতাঞ্জলি হইয়া শক্তিং দেহি, বলং দেহি, যশো দেহি, মানং দেহি—বারবার বলিতে পারে, সেই শক্তি-সমক্ষে গলদশ্রুলোচনে বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে পারে, কিন্তু যে শক্তিসেবার বীজ শিখে নাই, তাহার উপর মহাশক্তি প্রসন্না হইবেন কেন? ইংরাজ বিজ্ঞান-শক্তিবলে পঞ্চভূতকে আপনার করায়ত্ত করিয়াছে,—ইন্দ্র তাহার শকট-চালক, বরুণ তাহার কল-পরিচালক, সূর্য্য তাহার চিত্র-কর, চঞ্চলা তাহার সংবাদ-বাহিকা—বাঙ্গালি ইংরাজের বিজ্ঞান-শক্তির মূর্ত্তি দেখিয়া অভিভূত হইল, গলবস্ত্র হইয়া অহোরাত্র

সেই বিজ্ঞান-শক্তির কাছে বর যাচ্ঞা করিতেছে, কিন্তু যাহার আত্মচেষ্টা নাই তাহার উপর দেবী প্রসন্না হইবেন কেন ?

ইংরাজ শিখিতে বলিলে. বাঙ্গালি শিখিতে যায়, ইংরাজ লিখিতে বলিলে বাঙ্গালি লেখে, ইংরাজ আফিস খুলিলে বাঙ্গালির চাকুরি হয়, ইংরাজ রাস্তা করিয়া দিলে বাঙ্গালি পথ চলে, খাল কাটিয়া দিলে বাঙ্গালির নৌকা চলে ; ইংরাজের রাজনীতি-কৌশলে বাঙ্গালির মস্তিষ্ক বিলোড়িত হয়, ইংরাজের সমাজ-নীতির অনুকরণে বাঙ্গালি ব্যস্ত। ইংরাজের জ্ঞানশক্তি, বিদ্যাশক্তি, নীতিশক্তি—ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার শক্তির কাছে বাঙ্গালি গললগ্নীকৃতবাসে নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান্। সে বাঙ্গালির উপর মহাশক্তি প্রসন্না হইবেন কেন ? যে আপনার ভাল আপনি করিতে জানে না, পারে না, চায় না—ভগবান্ কখন তাহার ভাল করেন না !

---

# স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব

## কখন ফলিবে না কি ?

১

জ্বরে জীর্ণ ; দুর্ভাবনায় দুর্ব্বলতায় মাথা ঘুরে, কলির বন্ধুবান্ধবেরা কিন্তু সর্ব্বদাই অনর্থক ব্যস্ত করিতে নিরস্ত নহেন। প্লীহা-যকৃতে স্ফীতোদর লম্বোদর ভায়া আসিয়া

নিয়তই বলেন, "দাদা, আহারটা বুঝিয়া সুঝিয়া করিবেন ; যত রোগের মূলই আহার।" থিয়েটরে, গ্রীণরুমে, ব্লুরুমে, ব্লাক-রুমে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে ঢুলুঢুলু চক্ষে আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া নিবারণ ভায়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "দেখ দাদা, রাতটাত জেগে শরীরটা মাটি করিও না।" কাজেই মুখ বুজিয়া, চক্ষু মুদিয়া, প্রাণ গুঁজিয়া দিন কাটাই। রাত্রি আমি কাটাইতে পারি না, ভগবান্ কাটাইয়া দেন। তোমরা বলিলে বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সত্যসত্যই আমি প্রত্যহই মিরাকল্ (miracle) দেখিয়া থাকি। এই দুর্ভার রাত্রি যে আসিতেছে ও কাটিতেছে—এগুলি আমার পক্ষে জীবন্ত মিরাকল্ ব্যতীত আর কি বলিব ?

এইরূপেই মাসাবধি যাইতেছে, সে দিন উহারই মধ্যে একটু সুস্থ বোধ করিলাম। জিহ্বার যেন জড়তা ভাঙ্গিয়াছে, কাণের যেন তালা খুলিয়াছে, মাথার যেন ভার কমিয়াছে, শরীর যেন আপনারই বটে, প্রাণ যেন শরতের নির্ম্মল আকাশে এক এক বার উড়িয়া আসিতেছে, মনের ভিতর যেন আলেয়া লাগিতেছে। দুর্ব্বল প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তি বোধ হইল। অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলাম। চাহিয়া দেখি, আকাশে যেন কেমন একরূপ নীল-মাখান জরদের স্রোত চলিতেছে, সুদূরে যেন মৃদুমধুর ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যেন এক প্রকার মিঠা মিঠা সৌরভ আসিতেছে। পূর্ব্বের সেই কাতরতা, আর এখনকার ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি উভয়ই

লুপ্ত হইল। মন উদাস হইল, মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

২

পুত্র পার্শ্বে বসিয়া নবানুরাগে প্রকোষ্ঠ-প্রাচীর-বিলম্বিত ভারতের মানচিত্র পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন; তাঁহার জিজ্ঞাসার সাগ্রহধ্বনি আমার কাণে বাজিল।—"বাবা! এখানটা মাইসোর রাজ্য বলে কেন?" আমি আস্তে আস্তে চাহিয়া বলিলাম, "ওটা 'মাহিষর' রাজ্য।" "মাহিষর কি?" আমি বলিলাম,—"মহিষাসুর।" তখন পিতাপুত্রে উভয়েই খলখল হাস্য করিতে লাগিলাম। তাহার পর "গোদাবরীর" 'গোদা' মানে কি, 'বরী' মানেই বা কি? "কৃষ্ণার" জল কাল কি না? ভূ নয় বলিয়া কি "অভূ" পর্ব্বতের নাম হইয়াছে? "হিমালয় পর্ব্বতের কোর্‌টা উল্‌টাইয়া দিলেই চাল-চিত্রের মত হয়,"—এইরূপ কত সওয়ালই হইল, আর কত মীমাংসাই শুনিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে শরতের আকাশে শরতের মেঘ উঠিল,—এখানটা কাল, ওখানটা শাদা; এখানটা হন্ হন্ করিয়া যাইতেছে, ওখানটা মৃদু বাতাসে পালভরে নৌকার মত গদাইনস্করি চালে চলিয়াছে। পরিবার-মধ্যে মহা রোল উঠিল,—"এ বড়ী ক'টা আর শুকোয় না।" আমার মাথার

টিপ্ টিপ্ ক্রমে টুপ্ টুপ্ করিতে লাগিল। আবার আমার চিরবন্ধু উপাধানের সহিত নিগূঢ় পরামর্শ-জন্য সন্তর্পণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পার্শ্বোপবিষ্ট পুত্রের কণ্ঠ-নিঃসৃত বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, হিমাচল, নীলাচল, কাশ্মীর, কণৌজ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৩

দেখিলাম—স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত একখানি অপূর্ব্ব সুবিস্তৃত ভারতের মানচিত্রপটে শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমা যেন জীবন্ত শরীরে ঝল্‌মল্ করিতেছে। অঙ্গ কণ্টকিত হইল, হৃদয় পুলকিত হইল, হৃদ্‌যন্ত্রের ধীরগতির শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে মূর্ত্তি আর কখন ভুলিতে পারিব কি? সে জীবন্ত মানচিত্র কখন ভুলিতে পারিব কি?

ঊর্দ্ধে কৈলাস হইতে কামরূপ,—সমস্ত কাশ্মীর ও তিব্বৎ-ভূমি অগণিত দেবদেবীর রূপচ্ছটায় বিভাসিত হইতেছে, তাঁহাদের অলঙ্কার-আভায় বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হইতেছে, উজ্জ্বল কিরীট ঝক্‌মক্ করিতেছে, আর তলদেশে—ভারত-সাগর, বঙ্গসাগর অসংখ্য স্থির উর্ম্মি তুলিয়া নীল নৈবেদ্যে বেদীপীঠ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ধূপধূম-গন্ধে চারিদিক পরিপূরিত; মৃদু-মধুর ধীর-গম্ভীর অসংখ্য ঘণ্টারবে দিঙ্মণ্ডল শব্দিত। এ সকল আর ভুলিতে পারিব কি?

বিদ্রূপচ্ছলে মাহিষর রাজ্য মহিষাসুর বলিয়াছিলাম; দেখিলাম, সত্যসত্যই সেইখানে,—

"অধস্তান্ মহিষং তদ্বৎ
বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরোশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ
দানবং খড়গ-পাণিকং ॥"

প্রকাণ্ড মহিষাসুর অর্দ্ধশায়িত রহিয়াছে,—চোর-মণ্ডলে তাহার ক্ষুর চতুষ্টয়, বিজয়পুরে তাহার শৃঙ্গ, আর অর্দ্ধছিন্ন গ্রীবাদেশ হইতে সশস্ত্র নিজাম-অসুর উদ্ভূত হইয়া আরক্ত-লোচনে উর্দ্ধমুখে রহিয়াছে। তখন পুরাণে ইতিহাসে আমার মনোমধ্যে মেশামিশি হইল। ভাবিলাম, মাহিষর রাজ্য ধ্বংস করিয়াই ত এই বিষম দানবের উৎপত্তি বটে। ও দিকে সেতারা-সুরাট হইতে দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্র সিংহ বিষম আস্ফালন করিয়া তেজোবিস্ফারিত লোচনে, ভীষণ দংষ্ট্রে অসুরকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। সেই সিংহের উপরি সদর্পে দক্ষিণপাদ রাখিয়া, বামপদাঙ্গুষ্ঠে মহিষ-পৃষ্ঠে ভর দিয়া ধবলাচল-শিখর-কিরীটিনী দশভুজা দেবীমূর্ত্তি।

"জটাজূট-সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু-কৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়-সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাং ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং

মৃণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাং।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং ॥"

আবার,—

"প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদাং।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়ৎ ॥"

কিন্তু,—

"উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥"

সেই প্রসন্না অথচ চণ্ডিকা মূর্ত্তি, সেই যুবতী অথচ যোগিনী মূর্ত্তি, সেই দেবী অথচ মাতৃকামূর্ত্তি, সেই গৌরী অথচ শ্যামা মূর্ত্তি, সেই সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী মূর্ত্তি,—আর কখনও ভুলিতে পারিব কি? সেই যে জটাঘটা-মধ্য হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—ত্রিবেণী বাহির হইয়া সাগর-সঙ্গমে মিলিত হইতেছে,—সেই যে দেবীর তুষার-মণ্ডিত কিরীট-মণ্ডল কৈলাসে দেবাদিদেবের চরণ চুম্বন করিতেছে,—এ সকল কখন ভুলিতে পারিব কি?

৪

সে প্রতিমার অন্যান্য মূর্ত্তিও ভুলিতে পারিব না। পঞ্জাব-পীঠে (সাম্রাজ্যের) বিঘ্নবিনাশক গজপতি গজানন যোগাসনে ধ্যাননিমগ্ন; তাঁহার শঙ্খচক্র শিথিলহস্তে নিদ্রিত জড়বৎ

রহিয়াছে ; লম্বোদর—অসাড়, অচেতন, নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল। লম্বমান্ বৃহৎ শুণ্ড কচ্ছভূমিতে সাগরজল শোষণ করিতেছে ; বিশাল গণ্ডস্থলের পঞ্চক্ষত হইতে নিঃসৃত পঞ্চধারা শুণ্ডে সংমিলিত হইয়া, শুণ্ড বহিয়া সিন্ধুনদ-ধারায় সিন্ধু-লীন হইতেছে। বোধ হইল যেন, যোগাসনে গজপতি মহেশের মহাসমাধিতে চিত্ত স্থির করিয়াও অন্তরে ব্যাকুল। ভাবিলাম, স্বয়ং বিঘ্নবিনাশন এত উদ্বিগ্ন ! দেবত্বেও এত বিড়ম্বনা !

গজানন-বামে গজমোতি-কণ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তি। বরদা-ইন্দোরের শতদলদ্বয়ে চরণ ভর করিয়া দেবী বঙ্কিমঠামে মহাদেবী-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। কটিকিঙ্কিণীতে রাজপুতানার রত্নরাজি বিভাসিত হইতেছে, পাতিয়ালার শ্বেত হীরক-মুকুট অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মথুরার শ্রেষ্ঠী-গোষ্ঠীর প্রকোষ্ঠে লীলাকমল স্থাপন করিয়া দেবী আপন মনে বিভোরে অবস্থান করিতেছেন। দৃষ্টি যেন পাণিপথ-ক্ষেত্রে আকর্ষিত রহিয়াছে। দেবি, তোমার ও চমক কি ভাঙ্গিবে না ? আবার পাণিপথে মা, তুমি কি দেখিতেছ ?

মহাদেবীর বামে সরস্বতী মূর্ত্তি। মায়ের রূপচ্ছটায় বারাণসী হইতে মিথিলা অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। বক্ষে গৌতমক্ষেত্র,—শত হীরক-আভায় উজ্জ্বলীকৃত ; নবদ্বীপে কচ্ছপীতুম্বী রাখিয়া একমনে বাগীশ্বরী আলেয়া আলাপ করিতেছেন। আমি যেন শুনিলাম,—

(আবাহন)

কত নিদ্রা যাবে মা গো, রাজ-রাজেশ্বরি,
ভোগ-চক্ষু মেল মা গো, যোগ-পরিহরি।

চৌদিকে সন্তানগণ স্তন্য বিনা ক্ষুণ্ণ মন,
শ্রীমুখ নেহারে সবে যুগ যুগ ধরি;
উঠ উঠ জগন্মাত, কর গো কটাক্ষপাত,
রক্ষ রক্ষ রক্ষাকর্ত্রি, ভারত-ঈশ্বরি!

সর্ব্বশেষে, পূর্ব্বাঞ্চলে বাঙ্গালায় কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি। শিখণ্ডি-বাহনের শিখিপুচ্ছ ব্রহ্মদেশের উপকূল পর্য্যন্ত প্রলম্বিত, চন্দ্রক-কলাপ-জ্যোতিতে চট্টগ্রাম-চন্দ্রশেখর চাকচিক্যময়। সেই দেবতার বাবু—বাবুর দেবতা—যেমন চিরদিন দেখিয়াছি, তেমনই দেখিলাম।—সেই আস্বা করিয়া লম্বা কোঁচা নটবর-বিনিন্দিত বেশে রজত-কুসুম-শোভিত বুট-বক্ষে লটপট লুণ্ঠিত হইতেছে। সেই মাথার উপর ট্রঙ্করোড বর্দ্ধমান-রাণীগঞ্জ দিয়া টেরা হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই ভ্রমর-পাঁতির রেখা—ঈষৎ গোঁফের দেখা।—সেই সব। তবে এখন ধনুদণ্ডের গুণ গুটাইয়া বাবুগিরির বন-বিহারের যষ্টি করিয়াছেন; আর পক্ষিপক্ষযুক্ত শরটি চাঁচিয়া ছুলিয়া লেখনী করিয়া মসীপেষণের যন্ত্র করিয়াছেন। এখন এই বাবুদের মূর্ত্তি দেখিয়াই পুরাণো গানটি আমার মনে পড়িল,—

"ষড়ানন ভাই রে! তোর কেন নবাবী এত!
তোর বাপ ভিখারী, মা যোগিনী,—
তোর পায়ে ঘোঁড়তোলা জুত!!"

৫

দেব-সেনাপতির এইরূপ পরিণাম চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি যেন আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়া আমার উপর ভ্রূকুটি করিলেন, তাঁহার ময়ূর-বাহন পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল, অসুর-স্কন্ধস্থিত সর্পরাজ ফণা বিস্তার করিল, সুরাষ্ট্রের সিংহরাজ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, গণপতি শুণ্ড সঞ্চালন করিলেন, মহাদেবীর মহাযোগ ভঙ্গ হইল, তিনি শৈলশিখর হইতে আমার উপর সস্নেহ কটাক্ষপাত করিলেন, বাগ্‌দেবী মহাতানে আবার বীণালয়ে ধ্বনিত করিলেন,—

"রক্ষ রক্ষ রক্ষাকর্ত্রি, ভারত-ঈশ্বরি!"

সাগরের নৈবেদ্য সকল স্ফীত হইয়া উঠিল, মধ্যস্থিত মহানৈবেদ্য সিংহল দ্বীপ ঝলমল করিতে লাগিল, মহাবোধনের কাংস, ঝাঁঝর, ঘণ্টা, শঙ্খরবে চারিদিক্‌ শব্দিত হইল,—আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; শুনিতে পাইলাম যেন, এক দিকে দেবকণ্ঠে গীত হইতেছে,—

( বোধন )

যা দেবী মানচিত্রেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমোনমঃ॥

অন্য দিকে শত-নরকণ্ঠে এইরূপ মহাস্তোত্র ধ্বনিত হইতেছে,—

( স্তোত্র )

"সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং দৈত্যদর্পবিনাশিনীং।
সুরেন্দ্র-বন্দিতাং নিত্যাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
নানাভরণশোভাঢ্যা-বিচিত্রবসনাং শিবাং।
ত্রিলোকজননীমাদ্যাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
বালার্কারুণ-বর্ণাভাং কেয়ূরাঙ্গদভূষিতাং।
রত্নদীপ্তিকিরীটীঞ্চ তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
ভবার্ণবনিমগ্নানাং তারিণীং ভবসুন্দরীং।
ভীমাং শক্তিস্বরূপাণাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
পারিজাতবনান্তস্থাং সিদ্ধচারণসেবিতাং।
মুনিভিঃ সেবিতাং দেব্যাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
বিশ্বেশ্বরী-বিশ্বকর্ত্রীং বিশ্বস্য পালনীং পরাং।
বিশ্ববন্দ্যা-বিশ্বহন্ত্রীং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
হিমালয়সুতাং নিত্যাং হিমালয়নিবাসিনীং।
ব্রহ্মাদিবিষ্ণুনমিতাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
দুর্গতীনাং গতি ত্বং হি দুর্গসংসার-তারিণীং।
ঘোর দুর্গাচ্চ পাপাচ্চ ত্রাহি মাং পরমেশ্বরি॥"

আবার বাহিরে একজন ভিক্ষুক ক্ষীণস্বরে গাহিতেছে,—

( আগমনী )

( মোহাড়া )

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই,—
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছে কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হয়েছে জামাই।
শিবা এসে বলে মা!
শিবের সে দিন এখন আর নাই।
যারে পাগল পাগল ব'লে, বিবাহেরকালে,
সকলে দিলে ধিক্কার,
এখন সেই পাগলের সব অতুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার।
এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় না মেনে,
আনন্দ-কাননে জুড়াবার ঠাঁই॥

( চিতেন )

ফিরে এলে গিরি, কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়া যার—
তোমার সেই উমা এই এলো
সঙ্গে শিব-পরিবার।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ!
গঞ্জনা দূরে গেল;

আমার মা কৈ, মা কৈ, ব'লে উমা ঐ
ব্যগ্রা হ'য়ে দাঁড়াল!
বলে,—তোমার আশীর্ব্বাদে আছি মা ভাল,—
দুখিনীরো দুখ ভাব্‌তে হবে নাই ॥

ভাবিলাম, সত্য সত্যই কি তবে আর আমাদিগকে মায়ের ভাবনা ভাবিতে হইবে না? আমার এই স্বপ্ন সত্য সত্যই কি সফল হইবে?

---

## বাঙ্গালির দুর্গোৎসব

১

বাঙ্গালির দুর্গোৎসব বড়ই বৃহদ্‌ব্যাপার। বালক-কাল হইতে বর্ষে বর্ষে নিত্যক্রিয়ার মত, দিবাকরের উদয়াস্তের মত এই দুর্গোৎসব আমরা দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতেই দুর্গোৎসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না।

শারদীয়া মহাপূজার প্রতিমায় সর্ব্বকালিক উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি-সমষ্টি আছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং মানব কালে কালে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেব-ভক্তি পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে,—

দুর্গোৎসবের উপকরণে তাহার সকলগুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব সকল কালের সকল প্রকার পূজার সঙ্কলন বা Synthesis. শারদীয়া পূজা প্রকৃতই মহাপূজা। এরূপ পূজা আর কোন দেশে নাই। ইহা পূজার কল্পদ্রুম বা Encyclopædia. স্বার্থ-চালিত জুর্বট সাহেবের প্ররোচনায় যেমন জনকতক সাহেব-সুভো কলিকাতার গড়ের মাঠে নানা দেশের শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে জন-কতক মুনি-ঋষির খেয়ালে বা জনকতক স্বার্থপর পুরোহিতের প্ররোচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহানুষ্ঠান সংগৃহীত হয় নাই। যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণীপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাবে কালমাহাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মে স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে,—সেই ভাবে বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে নানারূপ উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; অতীত-ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শ মত সেই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। যে বিবর্ত্তন-বিকাশ জড়জীব-জগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম-বলেই সেই বৈদিক-কালের শক্তিরূপা অতসীবর্ণময়ী উজ্জ্বলা অনলশিখা আজি এই অধঃপতনের দুর্দ্দিনে সর্ব্বদেব-পরিবেষ্টিতা মহাশক্তিতে চণ্ডীমণ্ডপ মণ্ডিত করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্তি-শক্তি, উপনিষদের শব্দ-শক্তি, পুরাণের দেব-শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাতৃ-শক্তি, বাঙ্গালির কন্যা-শক্তি, আর কত কালের কতরূপ শক্তি আজি ইতিহাসের মহারাসায়নিক

সংযোগে দ্রঢ়ীভূত অথচ বিবর্ত্তনে বিকশিত হইয়া দুর্গোৎসবের কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি—গণশক্তি, রণশক্তি—পাশবশক্তি, দানবশক্তি—বৃক্ষশক্তি, শিলাশক্তি—অগণিত দেবশক্তি সেই মহাকেন্দ্রের মহাবৃত্তভাবে মহাশক্তির শক্তিপোষণ এবং শোভাময়ীর শোভা-বর্দ্ধন করিতেছে। এমন দালানভরা ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা প্রতিমা, এমন কালভরা পদ্ধতি, এমন জগৎভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পূজা, এমন প্রবৃত্তিভরা উৎসব আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব মানবের হৃদয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গালির পরম গৌরবের পরিচয়।

২

নিতান্ত অসভ্য মানবমণ্ডলী হইতে পরিস্ফুট-চিত্তবৃত্তি সভ্যজাতি পর্য্যন্ত সকল জাতিই সকল সময়ে, সকল দেশে, বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি বিশেষ শক্তিকে জড়জগতের জীবন বলিয়া মনে করিয়া ভয়-ভক্তি, সান্ত্বনা-রঞ্জনা, আরাধনা-উপাসনা করিয়া থাকে। প্রথমে মানবের কিরূপে শক্তি-জ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্ শক্তির আরাধনা করিতে আরম্ভ করে, পরে কালক্রমেই বা কোন্ শক্তির সত্তা মনুষ্য উপলব্ধি করে, —এ সকল কথার আলোচনা করায় আমাদের অদ্য কোন প্রয়োজনই নাই; মানব-হৃদয়ে দেবোপাসনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসচর্চ্চায় অদ্য আমরা প্রবৃত্ত নহি। উপাসকগণ সমস্ত্রে

সময়ে যে যে পদার্থে, যে ভাবে জগজ্জীবনীশক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং যে ভাবে সেই শক্তির উপাসনা করিয়াছেন, তাহারই কতক কতক বুঝা অদ্য আমাদের আবশ্যক।

সকল দেশেই বোধ হয়, উপাসনার প্রথম অঙ্কুর ভীতি-জড়িত। ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, সিংহ-শার্দ্দূল, শস্ত্র-সর্প—এই সকল সেই সময়ের উপাস্য দেবতা অথবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা। এরূপ দেবতার রঞ্জনা বা সান্ত্বনা করাই সেই সময়ের উপাসনা। শারদায়া মহাপূজায় এই ভীতিভয় উপাসনার সকলরূপ উপাস্যই আছেন, সকলরূপ অবলম্বনই ইহাতে বিদ্যমান্। আর সেই অসভ্য কালের উপাসনাই কি আমরা ছাড়িতে পারিয়াছি? এই বিশাল শ্মশানক্ষেত্রে অগণিত ভূতপ্রেত আজিও বীভৎস্যভাবে, বিকট মূর্ত্তিতে আমাদের অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকার-মধ্যে স্বেচ্ছা-বিচরণ করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে চিতাবহ্নির ধূসর আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় ভীষণকে আরও ভীষণতর বোধ হইতেছে। প্রেতগণের বিকট মূর্ত্তি, অট্টহাস্য, বীভৎস্য লীলা, পৈশাচিক ব্যবহারে আমরা সকলেই ভীত, স্তব্ধ, স্পন্দ-রহিত; কাজেই ভয়জড়িত হৃদয়ে নিতান্ত অসভ্যের মত আমরা সেই প্রেতগণেরই উপাসনা করিতেছি। তাহার উপর ঐ সকল দৈত্য-দানবের দারুণ দলন, সিংহ-শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, এবং রক্তমাংস-লোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট অস্ত্রসকলের প্রতিনিয়ত রক্তলালসার ঝঞ্চনা, আর ঐ তীব্রচক্ষু কণ্টক-জিহ্ব খল সর্পের কালকূট

বিস্তারণা। কাজেই আমরা পিশাচ-পীড়িত, দৈত্য-দলিত, সিংহ-হিংসিত, শস্ত্র-শাসিত এবং সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ভীতিভরে গলবস্ত্রে গলদশ্রু হইয়া এই প্রেত-পশু-দানব-সর্প-শক্তির নিয়ত উপাসনা করিতেছি। অসভ্যের দেবপূজা আমাদের নিত্যপূজা হইয়া উঠিয়াছে।

৩

এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদ, নদীর উপাসক। বাল্যক্রীড়ারত অপোগণ্ড মানব দেখিল—সম্মুখে মহান্ হিমালয় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সহস্র লইয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান্। সূর্য্যরশ্মিতে মস্তকের কিরীটপুঞ্জ ঝক্‌মক্ করিতেছে; মেঘের পর মেঘ আসিয়া বিশাল স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে,—পর্ব্বতের বিরাগ নাই, বিকম্প নাই। সহসা পর্ব্বত ভ্রূকুটি করিল, স্ফুলিঙ্গ ছুটিল, পরক্ষণেই ভীষণ গর্জ্জন। গুড়্ গুড়্ শব্দে আকাশপাতাল সেই গর্জ্জনে প্রতিধ্বনি করিতেছে। মানব তখন বুঝিল, পর্ব্বত রাগে, পর্ব্বত গর্জ্জায়, পর্ব্বত হাসে, পর্ব্বত কাঁদে। পর্ব্বত তাহারই মত; তবে তাহার অপেক্ষা প্রভূত বলশালী এবং বিশাল আয়ত। মানব বলিল—ঐ দেবতা। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ঝঞ্ঝার সময় আশ্রয় দেয়, রৌদ্রে ছায়াদান করে, কত পাখী ডাকিয়া আনিয়া গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দোল খাওয়ায়,—মানব বুঝিল এই এক দেবতা। নদী—তৃষ্ণার সময় শান্তিদায়িনী, রৌদ্রের সময় অবগাহনে স্নিগ্ধকারিণী,

কিন্তু রাগিলে খরস্রোতা, কূলপ্লাবনে সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়,—মানবের চক্ষে নদী আর এক দেবতা।

আর একটু সভ্য হইলে মানব শস্য-পূজা করে। যাহা জীবনের অবলম্বন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী। ক্রমে সকল বৃক্ষেরই উপকারিতা মনুষ্য উপলব্ধি করিতে থাকে, কাজেই উদ্ভিদ্-উপাসক হয়। দুর্গোৎসবে ইহার সকলগুলিই আছে। দুর্গোৎসবে পর্ব্বতের প্রতিনিধিরূপে শিলাখণ্ডের পূজা করিতে হয়, নদ-নদীর পূজা করিতে হয়, বিশেষ করিয়া শস্যের পূজা করিতে হয় এবং সাধারণভাবে সমস্ত উদ্ভিদ্‌জাতির প্রতিনিধি লইয়া উদ্ভিদের উপাসনা করিতে হয়। ইহারই নাম নবপত্রিকাপূজা।

রম্ভা কচ্বী হরিদ্রাচ জয়ন্তী বিল্ব-দাড়িমৌ।
অশোকোমানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা॥

নবপত্রিকার এই পরিচয় শুনিলে মনে হয়, এত গাছপালা থাকিতে এই নয়টিরই বা কেন পূজা হয় ?

ঐ প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর আছে,—ঐতিহাসিক, বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, কালে কালে মানব যত প্রকার উদ্ভিদের পূজা করিয়াছে, তাহার সকল প্রকার ঐ নয়টিতে আছে। বৈষয়িক ব্যাখ্যা এই যে, যে যে কার্য্যে মানবের উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়, তাহার সকল কার্য্যের উপযোগী এক এক উদ্ভিদ্ নমুনার

মত ঐ নয়টিতে আছে।—অন্নের জন্য ধান্য আছে, তরকারির জন্য কচ্বী আছে, মসলার জন্য হরিদ্রা আছে, মণ্ডের জন্য মান আছে, মিষ্টের জন্য রম্ভা আছে, অম্লের জন্য দাড়িম্ব আছে, ঔষধের জন্য বিল্ব আছে, শোভার জন্য অশোক আছে, উৎসবের জন্য জয়ন্তী আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখা অন্যরূপ। এক এক প্রকার উদ্ভিদ্-দর্শনে মনে এক এক রূপ ভাবের উদয় হয়। উদ্ভিদ্-অবলম্বনে মনে যে কয় প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে, নবপত্রিকায় তাহার সকলগুলিই হয়। গ্রন্থে আছে, রম্ভা শান্তিপ্রদায়িনী। আমাদের সত্য সত্যই বোধ হয়, কলাগাছগুলির বড়ই ঠাণ্ডা মূর্ত্তি।—কেমন জলভরা ভাব, সুগোল বলন, মসৃণ ত্বক্, শীতল স্পর্শ, ঠাণ্ডা সবুজ চওড়া পাতাগুলি যেন চিরদিনই ধীরে ধীরে দূরস্থিত আর্ত্তজনকে বীজন করিতেছে,—কোথাও যেন রুক্ষভাবের একটু ছায়াও নাই, যথার্থ শান্তমূর্ত্তি। জয়ন্তীর জয়শ্রী-ভাব। কদলীর শান্তিময়ী শোভা জয়ন্তীতে এক বিন্দু নাই, অথচ জয়ন্তীতে শোভার অভাব নাই,—ছোট ছোট পাতাগুলি কেমন সাজান-গোছান, অল্প বাতাসে কেমন ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে; তাহার সকলগুলিই চঞ্চল, সকলগুলিই উল্লসিত। জয়শ্রী এমনই বটে। অশোকে শোক-শান্তি হয়। সেই যে ফুলের ভরে বৃক্ষ নত হইয়াছে, শোভা ধরে না,—তবু অহঙ্কার নাই, দর্প নাই—তাহাতে শোকার্ত্তের শোক-শান্তি হয় কি না, আমরা জানি না, কিন্তু প্রাচীনেরা ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রের সকল ব্যাখ্যার অনুশীলন করিবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, এইরূপে দুর্গোৎসব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে নানা বিষয়ের সমষ্টি নানা ভাবে বিন্যস্ত আছে।

৪

মনুষ্য আবার সময়-বিশেষে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্রাদির উপাসক। এখনও অনেকে অনুমান করেন যে, "এক সময়ে পৃথিবীর সভ্য-স্থানের সর্ব্বত্র সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল; আসিরি, মিসর, যুনানী, রোমক সর্ব্বত্রই সূর্য্যোপাসনা ছিল,—আসিয়ার আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষরূপেই ছিল।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যঋষিগণ হিমালয়ের সানুদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উষারঞ্জিত নভোপটে নয়নক্ষেপ করিয়া সূর্য্যাগমন-প্রতীক্ষায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ রবে দিক্ পরিপূরিত করত সূর্য্যস্তোত্র পাঠ করিয়াছেন; মধ্যকালে তনুমিশ্র স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও সূর্য্য-মহিমা ভুলিতে পারেন নাই,—দিল্লীর নিকটস্থ যমুনা-পুলিনে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তানসেন ভৈরবরাগে সূর্য্য-বন্দনা করিয়াছেন,—

"প্রভাকর ভাস্কর, দিনকর দিবাকর,
ভানু প্রঘট বিহান।
তেরি উদয়িতে, পাপতাপ ছুটে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নি(য়)ম হোয়,
গুরুজ্ঞান ধ্যান॥

ঝকমকায়ত জগতপর, জগচক্ষু জ্যোতিরূপ,

কশ্যপসুত, জগতেকি প্রাণ।

কহে তানসেন, প্রভু, জগত-কবাট খুলত

দিযে বিদ্যাদান॥"

ইদানীন্তনকালে ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্‌টেয়ার নাস্তিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই বল্‌টেয়ার একবার সূর্য্যপানে চাহিয়া দেখিলেন, সেই জগচ্চক্ষুর জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল; তাঁহার মানস ভরিয়া উঠিল, হৃদয় গলিল; বল্‌টেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"যদি জগদীশ্বর থাকেন, তবে ঐ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি; আমি ঐ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।"

এইরূপে দেখা যায় যে, জগচ্ছবির উজ্জ্বল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কোন না কোন মনুষ্যের উপাসনীয়। নবগ্রহপূজা দুর্গোৎসবের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন, পূজার পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ স্বতন্ত্র। এরূপ বিভেদের ঐতিহাসিক, বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কোন যুক্তি আছে কি না, তাহা আমাদের বুঝিবার কথা, ভাবিবার কথা। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা যাঁহাদের পণ্ডশ্রম বলিয়া ধারণা নাই, তাঁহারা যদি এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যায়াম করেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালির এই বিষম ব্যাপার দুর্গোৎসব বাস্তবিক কি প্রকাণ্ড কাণ্ড। আপাততঃ ভাসাভাসা আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাই পরিস্ফুট

করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি আমাদিগের এই ক্ষীণ চেষ্টায় এই উৎসবের প্রকৃত গৌরব বাঙ্গালি-হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত হয়, তাহা হইলেই আমাদের যত্ন সফল হইবে।

৫

মনুষ্যকর্ত্তৃক মনুষ্যপূজা দুই প্রকারের,—অবতারে মনুষ্য-পূজা, কুমারীতে নারীপূজা। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ-গণ মধ্যে মধ্যে অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যভূমি ভারত-ক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাই নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ-চরিত্রে ভারতভূমি উজ্জ্বলীকৃত আছে। এই সকল অবতার-মূর্ত্তি দুর্গোৎসবের চালচিত্রে চিত্রিত থাকে এবং তাঁহাদের পূজা হয়।

আমাদের তন্ত্রে নারী-পূজা ; বিদেশের কোম্‌তে নারী-পূজা। নারীই সাক্ষাৎ-মূর্ত্তিতে প্রকৃতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃত্তি-শক্তি। নারী জন্মদাত্রী, পালয়িত্রী, জগদ্ধাত্রী, গৃহ-কর্ত্রী। নারী ভবসাগরের তরণী, জীবনের বন্ধনী। নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী ইহলোকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপা। নারীর মধ্যে কুমারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কুমারী শান্তির প্রতিমা, সরলতার ছবি, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী। অনন্তকোটি মানবের প্রসবিনী-শক্তি কুমারীতে অন্তর্নিহিত. কুমারী জগদম্বা-শক্তি। কুমারী সরমের সরলতা, আদরের কোমলতা। কুমারী লজ্জাশক্তি, দয়াশক্তি—শ্রদ্ধারূপা, ভক্তি-

রূপা। কুমারীপূজা, কুমারী-ভোজন দুর্গোৎসবের অঙ্গ। সেইরূপ মাতৃকাপূজা দুর্গোৎসবের অঙ্গ। সকলরূপ পূজাই দুর্গোৎসবে আছে।

সকল দেবতার পূজাও দুর্গোৎসবে আছে। ঈশ্বরের সৃজন-পালন-সংহরণ-মূর্ত্তিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ধন-শক্তি, জ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশক্তি—ইঁহাদের সকলেরই পৃথক্ চিত্র বা মূর্ত্তি আছে; পৃথক পূজা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি সকলেরই স্থান আছে, ধ্যান আছে, অর্চ্চনা আছে, আরাধনা আছে। আর সকল শক্তির সমষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তির মহাপূজা আছে।

মহাশক্তি অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত সংসারে বিরাজিতা; গ্রন্থ-কারেরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন,—

"সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥

শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥

ব্রাহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা॥

মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তির্ম্ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা॥

নৃপাণাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারং সংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তারতারিণী॥
সৎস্ব সুবুদ্ধিরূপাচ মেধাশক্তিস্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ।
এবংরূপাচ যা শক্তিঃ ময়া দত্তা শিবায় সা॥"

এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিসমষ্টির সহিত সমগ্র জড়শক্তি এবং দৈবশক্তি মিলিত হইলে তবে দুর্গা-প্রতিমা হয়। জড়-জগতের দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত, সিংহ-শার্দ্দূল, শস্ত্র-সর্প, ময়ূর-মূষিক, বৃক্ষ-গুল্ম, নদ-নদী, শিলা-মৃত্তি, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি; আর আধ্যাত্মিক জগতের প্রভা-শোভা, ধন-পণ, জ্ঞান-মান, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধৃতি-ক্ষমা, দয়া-লজ্জা, শৌর্য্য-বীর্য্য, স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি; আর দেবজগতের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি।—দুর্গোৎসবের প্রতিমায় এই ত্রিজগতের জাজ্বল্যময়ী মহামূর্ত্তি। দুর্গোৎসব বিশ্বপূজা।

৬

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি তাহার অনুমান-হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণা করিয়াছে; অন্য কোন দেশের কোন কবি, কোন দার্শনিক, কোন শাস্ত্রকার এরূপ ত্রিজগতের সমষ্টিতে জগজ্জীবনের পূজা কখন কল্পনাতেও

আনিয়াছেন কি ? সকল দেশেই ত ধর্ম্মোপাসনায় যুগের পর যুগান্তর হইয়াছে, স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে, পড়িয়াছে ; পশু-পূজা, বৃক্ষপূজা, নরপূজা, দেবপূজা—সকল দেশেই ত হইয়াছে, কিন্তু দুর্গোৎসবের মত এমন অতুল্য museum এবং অমূল্য laboratory আর কোথাও আছে কি ? বঙ্গবাসী মহাকালের সাহায্য লইয়া ঐ অপূর্ব্ব যাদুঘরে জগতের ধর্ম্মোপাসনার সকল স্তরগুলি একত্র করিয়াছে, আপনার প্রতিভাময়ী কল্পনার রাসায়নিক দাহনে তাহার অনেকগুলি গলাইয়াছে,—গলাইয়া এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়াছে ; যেগুলি গলে নাই, সেগুলি সেই মূর্ত্তির অলঙ্কাররূপে বড়ই মুন্সিয়ানায় সাজাইয়াছে। ধন্য বলি—এই বিশ্বময়ী ধারণা, আর ধন্য বলি—এই বিশ্বময়ী কল্পনা।

যেমন বিশ্বময়ী কল্পনাপ্রসূতা ঐ বিশ্বময়ী মূর্ত্তি, পূজার প্রকরণ-পদ্ধতিও তদুপযোগিনী। ঘট, পট, গঠনে মূর্ত্তির কল্পনা ; জ্ঞানে, ধ্যানে, মননে ধারণা। মহাপূজা 'চতুষ্কর্ম্মময়ী' এবং ত্রিবিধা।—"সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ।" সকল ভাবেই দেবীর পূজা হইতে পারে ;—

> "লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং মণ্ডলস্থাং তথৈব চ।
> পুস্তকস্থাং মহাদেবীং পাবকে প্রতিমাসু চ।
> চিত্রে চ বিশিখে খড়্গে জলস্থাঞ্চাপি পূজয়েৎ॥"

সর্ব্বকালেই দেবীর পূজা হইবে ;—

যাবদ্‌ভূর্বায়ুরাকাশং জলং বহ্নিশশিগ্রহাঃ।
তাবচ্চ চণ্ডিকাপূজা ভবিষ্যতি সদা ভুবি ॥"

পূজায় সকল প্রকরণই আছে, শুদ্ধি-সিদ্ধি, আচমন-প্রাণায়াম, মুদ্রা-মন্ত্র, বলি-হোম—সকলই আবশ্যক। অধিবাস-অধিষ্ঠান আরাত্রিক-আরাধনা—সকলই করিতে হয়। ধূপ-জ্বাল, দীপমাল—সকলই অনুসঙ্গ। বিশ্বপূজার উপকরণ বিশ্ব-সংগ্রহ। ফল-জল, পত্র-পুষ্প, স্বস্তিক-সিন্দূর, গন্ধ-চন্দন, কষায়-ঔষধি, শস্য-গব্য, মণি-রত্ন, ভোজ্য-ভোগ, নৈবেদ্য-শীতল—সকল পূজার সকল উপকরণ আহরণ করিতে হয়। মালির মালঞ্চ, বণিকের বিপণী, মণিহারীর মণিহার, গোলদারের গোলা আহরণ করিলে তবে দুর্গোৎসব হয়। বিশ্বভাণ্ডারের নমুনা লইয়া বিশ্বপ্রচলিত পদ্ধতিমত বিশ্বশক্তির পূজা।

হা ভগবান্! আমার দরিদ্রের অদৃষ্টে তবে কি তোমার বিশ্বশক্তি মূর্ত্তির পূজা হইবে না? না, এমন কখন হইতে পারে না,—আমাদের শাস্ত্র ত পক্ষপাতের শাস্ত্র নহে। শাস্ত্রের বিধান বড়ই উদার ;—

"সম্যক্ কল্পোদিতাং পূজাং যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে
উপচারাংস্তদা দাতুং পঞ্চৈতান্ বিতরেত্তদা ॥"

কি কি ?

গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।

তাও যদি না জুটে ?

অভাবে—গন্ধপুষ্পাভ্যাং।

তাও যদি আহরণ করিতে না পারি ?

তদভাবে—ভক্তিতঃ।

এমন কল্পনাও কখন হবে না, এমন উদার শাস্ত্রও আর কোথাও পাব না। কিছু না পারি, ভক্তি সম্ভাবনায় এস ভাই। একবার ভক্তিভরে বিশ্বশক্তি ব্রহ্মময়ীর ধ্যান করি।

---

সমাপ্ত